# আত্মকথার অন্তরালে নারীভাবনার ক্রমবির্বতন

শ্রয়ণা সেন

বাংলাদেশের মেয়েদের মধ্যে যিনি প্রথম নিজের কথাকে সকলের সামনে নিয়ে এলেন, তিনি রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৯-১৯০০)। মেয়েদেরও যে কিছু বক্তব্য থাকে, সকলের অগোচরে তাদের মধ্যেও যে আবেগ - অনুভূতি প্রকাশ পাওয়ার পথ খোঁজে, তা প্রথম বোঝালেন রাসসুন্দরী দেবী-ই। পাবনা জেলার পোতাজিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা পদ্মলোচন রায়। কিন্তু শৈশবেই তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। মাত্র বারো বছর বয়সে ফরিদপুর জেলার রামদিয়া গ্রামের ভূস্বামী সতীনাথ সরকারের (শিকদার) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সরল ও ভীরু স্বভাবের মেয়েটি শৈশবেই মায়ের কাছে শিখেছিলেন,

> ''...আমাদের দয়ামাধব আছেন, ভয় কি? তোমার যখন ভয় হইবে, তখন তুমি সেই দয়ামাধবকে ডাকিও, দয়ামাধবকে ডাকিলে তোমার আর ভয় থাকিবে না।''

শৈশবে শোনা এই কথাগুলির নির্ভর করেই রামসুন্দীর দেবী সারাজীবন কাটিয়েছিলেন। জীবনের প্রতিটি ঘটনাকে তিনি 'দয়ামাধবে'র লীলা মনে করতেন। তাই আনন্দ - দুঃখ -শোক- কোনটাই তাঁকে খুব বেশি বিচলিত করতে পারে নি। এমনকি বারোজন সন্তানের জননী হওয়ার পর তিনি লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন শুধু মাত্র 'চৈতন্য ভাগবত' -এর পুঁথি পড়ার জন্য। একগাল ঘোমটা দিয়ে, বৃহৎ পরিবারের সমস্ত কাজ সামলে, গুরুজনদের সেবা ও ছোটদের দেখাশুনা করার পরে যে সামান্য সময় পেতেন, প্রাণপণে লেখাপড়া শেখার চেষ্টা করতেন। সেই চেষ্টার বিবরণ পড়তে পড়তে বিস্মিত হতে হয়—

> ''তখন আমার বড় ছেলেটি তালপাতাতে লিখিত। আমি তাহার একটি তালের পাতাও লুকাইয়া রাখিলাম। ঐ তাল পাতাটি একবার দেখি, আবার ঐ পুস্তকের পাতাটিও দেখি, আর আমার মনের অক্ষরের সঙ্গে যোগ করিয়া মিলাইয়া মিলাইয়া দেখি।''

একদিকে এই মরিয়া চেষ্টা, অন্যদিকে দয়ামাধবের কাছে একান্ত প্রার্থনা—

> ''পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও।''

অবশেষে তিনি পড়তে ও লিখতে শিখলেন। শেষ জীবনে লিখে ফেললেন তাঁর নিজেরই কথা। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকটি কবিতাও। এই সময়ে বাংলা গদ্যের ভাষা কি হবে, তা স্থিরীকৃত ছিল না। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল। রাসসুন্দরী এই বিতর্কে না গিয়ে বেছে নিলেন তৎসম শব্দের বাহুল্যবর্জিত, সহজ, আটপৌরে সাধুভাষা। তাঁর সামনে গদ্যের তেমন কোনো উদাহরণও ছিল না। কারণ তিনি মূলত পড়তেন পয়ার ছন্দে লেখা ধর্মীয় পুস্তক। তবুও তাঁর 'আমার জীবন' পড়তে কোথাও অসুবিধা হয় না এর ঝরঝরে বাচনভঙ্গির জন্য।

রাসসুন্দরী দেবী জীবনে দুঃখ পেয়েছিলেন বহুবার। তাঁর বারোজন সন্তানের মধ্যে সাতজনকে তিনি অকালে হারিয়েছিলেন। তবু তিনি তাঁর ইষ্টদেবতার প্রতি অসামান্য ভক্তিবশত: এ-সবকিছুকেই সহজে গ্রহণ করেছিলেন। তবে তিনি পিত্রালয় ও শ্বশুরালয়ে কখনো অনাদর বা অসম্মান পান নি। কিন্তু সারদাসুন্দরী দেবী সেই কষ্ট ভোগ করেছেন জীবনের বেশির ভাগ সময় ধরে। ২৪ পরগণা জেলার গৌরীভা গ্রামে দাসের কন্যা সারদাসুন্দরী দেবীর (১৮১৯-১৯০৭) বিয়ে হয় মাত্র ন'বছর বয়সে দেওয়ান রামকমল সেনের মেজো ছেলে প্যারীচরণ সেনের সঙ্গে। কিন্তু শ্বশুরবাড়ির অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে সুখদায়ক ছিল না। তাঁর শাশুড়ির বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, তাঁর বয়স মোটেও দশ বছর নয়, আরও অনেক বেশি। তাই অনেক সময়েই লঘু পাপে গুরুদণ্ড হতো সারদাসুন্দরীর। শুধু তাই-ই নয়, তাঁর ভাষায় বলতে গেলে—

> ''আমাদের অনেক দাসদাসী ছিল কিন্তু আমার শাশুড়ী দাসীকে ঘরে আসিতে দিতেন না। সেই বড় বড় ঘরগুলি আমাদের ধুইতে হইত। কোনরকম কষ্টেসৃষ্টে যদি ধুইতাম, কিন্তু ন্যাকড়া দিয়া মুছিতে পারিতাম না, অত বড় ঘর মুছিবার ন্যাকড়া হাতে ধরিতে পারিতাম না। সমস্ত দিন এইরূপ কাজ করিতে করিতে এক একবার খেলা করিতে ইচ্ছা হইত। কিন্তু একটু খেলা করিতে দেখিলেই শাশুড়ী বিরক্ত হইতেন।''

তবে সারদাসুন্দরী দেবী সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেয়েছিলেন স্বামীর অকালমৃত্যুর পর। মাত্র ঊনত্রিশ বছর বয়সে বিধবা হন তিনি। প্যারীচরণের মৃত্যুর মাত্র পনরো দিন পর থেকে শুরু হয় অত্যাচার। প্রথমে তাদের তিনতলার ঘর থেকে দরজা কপাট ভেঙে বড় খাটটি বের করে নিয়ে চান তাঁর সেজো দেওর। তারপর সিন্দুক খুলে প্যারীচরণের ব্যবহৃত বাকি মহার্ঘ জিনিসগুলিও নিয়ে যাওয়া হয়। স্বামীর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে দুটি শাল চেয়েছিলেন সারদাসুন্দরী দেবী। একটি পেয়েছিলেন, শেষে তাঁর মনে এই ভয়ও দেখা দিল যে, তিনিও হয়তো ছেলেমেয়ে সমতে শ্বশুরবাড়ি থেকে বিতাড়িত হবেন। বোঝা যায়, বঙ্গদেশে সতীদাহ প্রথা এত ব্যাপক হারে কেন প্রচলিত ছিল। বিধবাদের স্বামীর সম্পত্তিতেই নয়, সন্তানদের ব্যাপারে মতামত দেওয়ার অধিকারও তিনি হারিয়েছিলেন। মেয়েদের বিয়ে হয়েছিল অপাত্রে। কিন্তু ছেলে ব্রাহ্ম হওয়ার সব দোষ বর্তেছিল মা'য়ের উপরেই। সেই ছেলে সাধারণ কেউ ছিলেন না, তিনি কেশবচন্দ্র সেন

> ''তাঁহার ব্রাহ্ম হওয়ায় আমি অনেক ভুগিয়াছি। ভাসুরের নিকট অনেক গালাগলি খাইয়াছি।''

ভারতবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব কেশবচন্দ্রের মা'য়ের এই কাহিনি অনুচ্চারিতও থেকে যেত, যদি না যোগেন্দ্রলাল খাস্তগীর

সারদাসুন্দরী দেবীর মুখে বলা কথাগুলির অনুলিখন না করতেন। রচনাটি 'আত্মকথা' নামে 'মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সারাদাসুন্দরীর দেবী নিজেও কিছু কিছু পড়াশুনা শিখেছিলেন স্বামীর উৎসাহে। কিন্তু অকালবৈধব্য সেই প্রচেষ্টাকে বেশিদূর এগোতে দেয় নি।

স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া শিখেছিলেন কৈলাসবাসিনী দেবীও (১৮২৯-১৮৯৫)। রাজপুরের গোরাচাঁদ ঘোষের কন্যা কৈলাসবাসিনী দেবীর বিয়ে হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের ছোট ভাই, বিখ্যাত সমাজসংস্কারক কিশোরীচাঁদ মিত্রের সঙ্গে এগারো বছর বয়সে। তিনি আত্মকথা লিখেছেন ডায়েরীর আকারে। যা একপাশে রয়েছে গয়নার ফর্দ, মাসকাবারের হিসাবপত্র ও অন্যপাশে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের নানা কথা। উদারমনস্ক কিশোরীচাঁদ চেয়েছিলেন, স্ত্রীকে সুযোগ্য সহধর্মিণী করে তুলতে। কৈলাসবাসিনীও তা হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। কিন্তু হিন্দু ধর্মের সংস্কারে একেবারে ছাড়তে পারেন নি, বলা ভাল, ছাড়তে চান নি। মানসিক সংস্কারবশত: নয়, সমাজচ্যুত হওয়ার ভয়ে—

> ''আমি হিন্দুয়ানি মানিনে কিন্তু বরাবর খুব হিন্দুয়ানি করি। তার কারণ আমি যদি আলগা দিই তাহলে স্বামী আর হিন্দুয়ানি রাকিবেন না। হিন্দুরা হলেন আমার পরম আত্মীয়।''

কৈলাসবাসিনী দেবীর ডায়েরী পড়লে বোঝা যায়, স্বামী গরবে গরবিনী ছিলেন তিনি। তিনি জানতেন, তাঁর মতো স্ত্রীভাগ্য সকলের হয় না। কিন্তু এই কৈলাসবাসিনীই তাঁর স্বামী তাঁকে কখনো অনাদর করেছেন কিনা, (স্বমীর) এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন,

> ''যথার্থ বলিব? অনাদর কর নাই বটে, কিন্তু আমিও কখন অনাদর কর্ম করি নাই।''

এই কণ্ঠস্বর স্বামীর প্রতি ভক্তিমতা স্ত্রীর নয়, আত্মমর্যাদা সচেতন এক নারীর। বোঝা যায়, নারীর আত্মসচেতনতা কোনো নতুন কথা নয়। কৈলাসবাসিনী দেবীর মৃত্যুর অনেক পরে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনী 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়েরী' নামে প্রকাশিত হয়।

রাসসুন্দরী, সারদাসুন্দরী, কৈলাসবাসিনী দেবী— এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন ধনী পরিবারের বধূ। সারদাসুন্দরী ছাড়া বাকি দু'জন শ্বশুরবাড়িতে অনাদরও পান নি। কিন্তু নিস্তারিণী দেবী (১৯৩৩-১৯১৬) কোনদিন তাঁর শ্বশুরবাড়িতেই যেতে পারেননি। কারণ তিনি ছিলেন 'কুলীনের মেয়ে'। শ্লীম্যান সাহেবের অন্যতম প্রধান সহকারী হরচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা নিস্তারিণীর জন্ম বর্ধমানের খন্যান গ্রামে। বিয়ে হয়েছিল খানাকুল কৃষ্ণনগরের কুলীন ব্রাহ্মণ ঈশ্বরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে, বিবাহই ছিল যাঁর পেশা। বিয়ের পর, স্বামীর সঙ্গে নিস্তারিণীর দেখা হয়েছিল মাত্র দু'বার। অল্পবয়সেই বিধবা হওয়ার পর মামার বাড়িতে ও পরে ভাইদের বাড়িতে দাসীবৃত্তি করেই জীবন কাটাতে হয় তাঁকে। নিঃসন্তান নিস্তারিণী দেবী সারাজীবন অশেষ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। পেটের জ্বালায় তিনি ভাই-ভাইপোদের দরজায় দরজায় ঘুরতে বাধ্য হয়েছিলেন। আশ্রয় পেলেও দু'দিন পরে আবার উদ্বাস্তু হয়েছেন। অবশ্য আশ্রয় পাওয়ার মূল্যও দিতে হয়েছে তাঁকে। তিনি জানতেন,

> ''যার সংসারে যাব, রাঁধবো।''

তবু কি নিদারুণ যন্ত্রণা পেয়েছেন তিনি!

> ''ছোটমামী খাওয়াতে চায় না। বলে অন্য মামাতো ভাইদের কাছে যাও। রামচরণ এক টাকা করে দেবে বল্লে, ছোটামামী একটাকা করে দিলে। দু'টাকায় তো খাওয়া এক বেলাও হয় না।''

ফলে আবার শুরু হয় অনিশ্চয়তা—

> ''কালীর মেজো ছেলের কাছে গেলুম, সে একটাকা করে দিতে চাইলে, একমাস দিয়ে শেষে বৌরা আর দিতে চায় না, বলে কিসের টাকা। বড় ছেলের কাছে গেলুম। সে বলে, একটা একটা দোয়ানী রেখে দিলেই মাসে আটটা দোয়ানী হবে। তোমার ভাবনা কি? সেও একমাস আটটি দোয়ানী তুলে রেখে দিয়েছিল। শেষে আর তুলে রাখতে ভুলে যায়।''

অথচ নিস্তারিণী দেবীর দাদা দেবীচরণ ছিলেন থানার দারোগা, ভাই রেভারেন্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাইপো ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। নামী পরিবার, কৃতবিদ্য আত্মীয়-স্বজন। তবু এই বিধবা, অসহায় মেয়েটিকে মানুষ হিসেবে সামান্য দয়াও দেখান নি কেউ—

> ''ডালপালা কুড়িয়ে পাতার জ্বালে রেঁধে খাই। ডালপালার ধোঁয়া হলে তারা বিরক্ত হয়। সবাই বল্লে, আমাদের রান্নাখাওয়া হলে, তবে তোমার ডালপালার ধোঁয়া কত্তে পারবে।''

ভাত জুটলেও তরকারি জুটত না। আলুর খোসা ভাজা, কিংবা পেয়ারা দিয়ে ভাত মেখে খেতেন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, এ কোন্ কালের কথা বলছেন নিস্তারিণী দেবী তাঁর 'সেকেলে কথা'য়? তাঁর মতো আরও অনেক মেয়েও হয়তো এভাবেই জীবন কাটিয়েছেন। নিস্তারিণী দেবী এভাবে না জানালে হয়তো জানাও যেত না, কুলীন মেয়েদের জীবনের এই বীভৎস রূপ। শেষ জীবনে তিনি আশ্রয় পেয়েছিলেন ছোট ভাইয়ের পৌত্র মন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তিনিই নিরক্ষর নিস্তারিণী দেবীর কথাগুলি অনুলিখন করেছেন, যা 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

যশোহর জেলার মগুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন স্থিরসৌদামিনী দেবী (১৮৪২-১৯২৫)। পিতা হরিনারায়ণ ঘোষ। শৈশবে তাঁর বিয়ে হয়েছিল মতিলাল বকশীর সঙ্গে। স্থিরসৌদামিনীর ছোট বোন ছিলেন রাসসুন্দরী দেবীর পুত্রবধূ। 'আমাদের পারিবারিক কাহিনী' নামে তিনি নিজের পরিবারের কথা লিখেছেন। যেখানে তাঁর পিতৃগৃহের অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। চেয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ির কথাও লিখতে কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয়নি।

রচনাটি পান্ডুলিপির আকারেই রয়ে গেছে শ্রীস্বরূপকান্তি ঘোষের কাছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্ত: পুরিকাদের মধ্যে প্রথম আত্মচরিত পাওয়া যায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর (১৮৫০-১৯৪১)। তাঁর আত্মচরিত 'পুরাতনী' অবশ্য তিনি নিজে লেখেন নি। বৃদ্ধ বয়সে মুখে মুখে বলেছিলেন, লিখেছিলেন তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবী। মাত্র আট বছর বয়সে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। জ্ঞানদানন্দিনীর জবীন আর পাঁচটি বধূর মতো ছিল না। নানা বৈচিত্র্যে ভরা ছিল তাঁর জীবন। তাই তাঁর আত্মজীবনীও অত্যন্ত আকর্ষণীয়। স্বামীর উদ্যোগেই তিনি বোম্বাই ও পরে ইংলন্ডে যান। বোম্বাই থেকেই তিনি আধুনিক ধাঁচে সাড়ি পরার কায়দা রপ্ত করেছিলেন, যা পরে ঠাকুরবাড়ি এবং ধীরে ধীরে অন্যান্য অভিজাত বাড়িতেও প্রচলিত হয়ে মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরোনোকেসহজ করে। তিনি অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। সাহিত্য রচনা করেছেন, পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। তবে তিনি একেবারে অন্যধরণের জীবন অতিবাহিত করেছিলেন বলে তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি বিভিন্ন উপাদানে পূর্ণ ছিল। যা ধরা পড়েছে তাঁর স্মৃতিকথায়।

ঠাকুরবাড়ির আরেকজন বধূ প্রফুল্লময়ী দেবীর আত্মকথা 'আমাদের কথা' অনুলিখন করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা রমা দেবী। প্রফুল্লময়ীর (১৮৫২ - ১৯৪০) পিতা হরদেব চট্টোপাধ্যায় ও মহর্ষি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সেই বন্ধুত্ব আত্মীয়তায় পরিণত করতে মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথের সঘে প্রফুল্লময়ীর বিবাহ স্থির হয়। কিন্তু হিন্দু কন্যার ব্রাহ্ম পরিবারে ব্রাহ্ম মতে বিবাহকে হরদেবের পরিবার মানতে চায় নি। বিবাহের দিন গণ্ডগোলের আশঙ্কায় পুলিশি প্রহরায় বিবাহ হয়। বন্ধুত্বের জন্য সমাজকে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন হরদেব চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই বিবাহ সুখের হয়নি। কয়েক বছর পর বীরেন্দ্রনাথ উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হন। তাঁদের একমাত্র পুত্র লেখক বলেন্দ্রনাথও অকালে মারা যান। ক্ষুদ্র আত্মকথার পরিধিতে প্রফুল্লময়ী শোকতপ্ত এই জীবনের কথাই স্থান পেয়েছে।

উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন প্রসন্নময়ী দেবীর (১৮৫৭-১৯৩৯) স্বামী কৃষ্ণকুমার বাগচী-ও। বিবাহিত জীন ব্যথ হয়ে যাওয়াকে ভাগ্যলিপি বলে মেনে না নিয়ে তিনি পিতৃগৃহে থেকে বাকি জীবন পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন এবং সেই সঙ্গে 'আধ আধ ভাষিণী', 'আর্যাবর্ত', 'অশোকা' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করে বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর একমাত্র কন্যা প্রিয়ংপদা দেবীও মহিলা কবিরূপে প্রতিষ্ঠা পান। প্রসন্নময়ীর পিতা ছিলেন হরিপুরের ভূস্বামী দুর্গাদাস চৌধুরী,বিখ্যাত শিকারী কুমুদনাথ চৌধুরী, কর্ণেল মন্মথনাথ চৌধুরী, 'সবুজপত্র'-এর সম্পাদক তথা কবি ও সাহিত্যিত প্রথম চৌধুরী প্রমুখ। প্রসন্নময়ীর আত্মজীবনী 'পূর্বকথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'সুপ্রভাত' পত্রিকায়। সেখান থেকেই জানা যায়, শৈশবের কয়েকটি ঘটনা তাঁর মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। একদা তাঁর এক পিতৃবন্ধুর স্ত্রী অকালে মারা যাওয়ার পর সেই ভদ্রলোক স্ত্রী শোকে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর এক কাকা তাঁর এই অবস্থান শুনে ভর্ৎসনা করে বলেন,

> ''স্ত্রী একজোড়া চটি জুতা বই তো না। একজোড়া গিয়েছে আরেক জোড়া তার চেয়েও ভাল আনিয়ে দেব।''

প্রসন্নময়ীর মনে প্রশ্ন জেগেছিল এই কি তবে স্ত্রী মর্যাদা? কিন্তু ধনী ও শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিবাহ হয়েছিল সামাজিক প্রথা মেনে, 'করণ' অনুষ্ঠান করে, তাঁর অযোগ্য পাত্রের সঙ্গে। কারণ, তাঁর মতে,

> ''সামাজিক নিয়ম হঠাৎ ভাঙিয়ে দেওয়া ত বড় কঠিন।''

মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হয়েও সমাজকে অস্বীকার করতে পারেন নি তিনি।

সামাজিক নিয়মকে হঠাৎ ভেঙে দেওয়ার সাহস দেখিয়েছিলেন সুদক্ষিণা সেনের (১৮৫৯-১৯৩৪) মা। বিক্রমপুরের বাসিন্দা সুদক্ষিণার পিতা জগদ্বন্ধু মুখোপাধ্যায় ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। তবে তিনি কৌলিন্য প্রথার চেয়ে সন্তানদের শিক্ষার দিকেই বেশি জোর দিতে চেয়েছিলেন। অকালমৃত্যু তাঁকে সেই সুযোগ দেয় নি। সুদক্ষিণা লিখছেন,

> ''দাদাকে অতি বাল্যে আমার কাকারা বিবাহ দেওয়ায় আমার মাতৃদেবী আরও ভীতা হইয়াছিলেন পাছে তাঁহারা আমাদেরও কোন সপত্নীগৃহে শৈশবেই বিবাহ দিতে বাধ্য করান।''

এজন্য তিনি ছেলেমেয়েদের নিয়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন ব্রাহ্মসমাজে। শুধু তাই নয়, মেয়েদের বিয়ে দিলেন বৈদ্য ও কায়স্থ পাত্রের সঙ্গে। সুদক্ষিণার আত্মজীবনী 'জীবন স্মৃতি' শুধুমাত্র তাঁর নিজের জীবনের কথা নয়। তাঁর মায়ের দুঃসাহসিক এই কাজ আরও অনেক মায়েদের মনে আশা জাগিয়েছিল, সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে হিন্দুধর্মের নিয়মের ক্ষয়িষ্ণুতা ও ব্রাহ্ম সমাজের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির স্বরূপটিও তাঁর লেখায় অত্যন্ত স্পষ্ট। হিন্দুধর্মের অত্যাচার অসহ্য করতে না পেরে ব্রাহ্মসমাজে আসা আরও দুটি মেয়ের কথাও রয়েছে এই গ্রন্থে। সুদক্ষিণার এই গ্রন্থ আসলে দুই সমাজের মধ্যে এক যোগসূত্র বিশেষ। সমাজের এই পালাবদল নারীদের জাগরণে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, ইতিহাসই তার সাক্ষী। আর সেই সময়টাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে সুদক্ষিণার লেখায়।

ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজের মধ্যে প্রথার এই কড়াকড়ি মেনে নিয়ে থেকেও গিয়েছিলেন অনেকে। ব্রাহ্মসমাজে যাওয়ার কথা ভাবেন নি। কিন্তু সমাজের অন্য আরেকটি রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন বিনোদিনী দাসী ( ১৮৬৩-১৯৪১)

বা নটী বিনোদিনী। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার কথা' বহু দিক দিয়েই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনোদিনী সুলেখিকা চিলেন। 'আমাদের কথা'তেও তাঁর স্বাক্ষর আছে। যে সময়ে সাধারণ পরিবারের মেয়েদেরও সামান্য মর্যাদা, অধিকারের জন্য কঠিন লড়াই করতে হচ্ছিল। সেই হিন্দু সমাজে অসমাজিক পথে পা বাড়ানো মেয়েদের অবস্থা যে কি হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। তবে বিনোদিনী আর পাঁচটা সাধারণ বারাঙ্গনা মাত্র ছিলেন না। বাংলা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয় ও সফল অভিনেত্রীও ছিলেন তিনি। সমাজের উপরতলার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগও ছিল তার। সেই সূত্রেই তিনি অনেক কাছ থেকে দেখতে পেয়েছিলেন সমাজের উপর তলার আসল রূপটিকে, প্রতারকে চেহারাটিকে। বিনোদিনী লিখেছেন,

> ''আমার জীবন শূণ্য মরুময়! আমার আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, ধর্ম নাই, কর্ম নাই, কার্য নাই, কারণ নাই! এই শেষ জীবনে ভগ্ন হৃদয়ে জ্বালাময়ী প্রাণ লইয়া অসীম যন্ত্রণার ভার বহিয়া আমি মৃত্যু পথপানে চাহিয়া আছি।''

অথচ এই অভিনেত্রীর জীবনে বন্ধু ছিলেন অনেকেই। স্টার থিয়েটার নির্মাণ করার সময়ে এই বন্ধুরাই তাঁকে উৎসাহ জুগিয়েছিলেন—

> ''এই থিয়েটার হাউস হইবে, ইহা তোমার নামের সহিত যোগ থাকিবে। তাহা হইলে তোমার মৃত্যুর পরও তোমার নামটি বজায় থাকিবে। অর্থাৎ এই থিয়েটারের নাম ''বি'' থিয়েটার হইবে।''

এই থিয়েটারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন বিনোদিনী। এটি ছিল তাঁর স্বপ্নের সৌধ। কিন্তু সেই বন্ধুরাই ঠকিয়েছিলেন তাঁকে। নাম রেজিস্ট্রি করে এসে দাসুবাবু অম্লানবদনে বলেছিলেন, থিয়েটারের নামকরণ হয়েছে 'স্টার'। বিনোদিনীর সব আশাকে এক নিমেষে গুঁড়িয়ে দিতে একটুও কষ্ট হয়নি তাঁদের। পরে থিয়েটারের মালিকানা থেকেও বঞ্চিত করা হয় তাঁকে। শুধু তাই-ই নয়, একমাত্র মেয়ে শকুন্তলাকে স্কুলে পাঠিয়ে সামান্য লেখাপড়া শেখাতে চেয়েছিলেন তিনি। বন্ধুরা সে ব্যাপারে সাহায্য তো করেন -ই নি, বরং যাতে কোনও বিদ্যালয়ে সে ভর্তি হতে না পারে, সেই চেষ্টাই করেছিলেন 'বন্ধু' সমাজপতিরা। ব্যক্তিগত তথা সামাজিক জীবনে বিনোদিনী কতটা একা ছিলেন, তা বোঝা যায় 'আমার জীবন' পড়লে। এছাড়াও তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন 'আমার অভিনেত্রী জীবন' ও 'অভিনেত্রীর আত্মকথা'। কিন্তু শেষ করেননি। নিস্তারিণী দেবী, রাসসুন্দরী দেবীরা সমাজের নিময়কে ভাঙার কথা ভাবেননি কখনো। কিন্তু সমাজের চোখে অবহেলা, অশ্রদ্ধার পাত্রী নটী বিনোদিনী সমাজপতিদের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন তাঁর আত্মকথায়।

সমকালীন মহিলা আত্মচরিত রচয়িতারা সকলেই যে সমাজের বা কোনো বিশেষ ঘটনার কথা তাঁদের রচনায় বলেছেন, তা নয়। শুধুমাত্র নিজেদের কথাও বলেছেন অনেকে। যেমন- মাইকেল মধুসূদন দত্তের জ্ঞাতিভ্রাতার কন্যা মানকুমারী বসু'র (১৮৬৩-১৯৪৩) আত্মজীবনী 'আমার অতীত কাহিনী' ('উত্তরা' পত্রিকায় প্রকাশিত), রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যা কমলা বসু'র (১৮৬৬-১৯৩৯) আত্মকথা, মৃণালিনী দেবী'র আত্মকথা ' পৌরাণিকী' ('ভারতবর্ষ' পত্রিকায় প্রকাশিত, কিন্তু অসমাপ্ত), জীবনানন্দ দাশের মা কুসুমকুমারীর দাশের (১৮৭৫-১৯৮৪) অসমাপ্ত জীবনকথা 'স্মৃতিসুধা' ও দিনলিপি, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর কনা পুণ্যলতা চক্রবর্তীর (১৯৮৯-১৯৭৪) দুটি স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ 'একাল যখন শুরু হল' ও 'ছেলেবেলার দিনগুলি' (শৈশবের কাহিনী, ছোটদের মতো করে লেখা), সাহানা দেবীর আত্মকথা 'স্মৃতির খেয়া' (বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় খণ্ড খণ্ড আকরে প্রকাশিত)-এই গ্রন্থগুলিতে মূলত লেখিকাদের শৈশবস্মৃতি, বিবাহ, বিবাহিত জীবনের নানা ঘটনা বর্ণিত। এরকমই বিষয়বস্তু পাওয়া যায় মানোদা দেবীর (১৮৭৮-১৯৬৩) আত্মকথা 'জনৈকা গৃহবধূর ডায়রী' -তে এবং পূর্ণশশী দেবীর স্মৃতিকথায় (প্রথম খণ্ড 'মনে পড়ে', দ্বিতীয় খণ্ড 'সচিত্র শিশির')। তবে তাঁরা যথাক্রমে গেন্ডেরিয়া ও পাঞ্জাবে বসবাস করতেন। মানোদা দেবী ছিলেন সমাজ সেবিকা ও গান্ধীজীর আদর্শে অনুপ্রেরিতা এবং পূর্ণশশী দেবী কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত লেখিকা। তাই তাঁদের লেখায় তঁদের নিজেদের জীবনের কথা ছাড়াও তাঁদের কাজের কথাও রয়েছে। ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে এবং ব্রাহ্ম পরিবারেরই বধূ শরৎকুমারী (১৮৬২-১৯৪১) আত্মজীবনী 'আমার সংসার' -এ তাঁর নিজের পরিবারের কথা, নিজের কথা থাকলেও দ্বিধাবিভক্ত ব্রাহ্মসমাজের রূপটিও ধরা পড়েছে। কারণ তাঁর পিতা কেশবচন্দ্র সেনের সমাজভুক্ত হন এবং স্বামী ও শ্বশুর যোগ দেন সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে। দুই পরিবারের বিরোধে শরৎকুমারীর অবস্থাটাও এখানে স্পষ্ট। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিধাবিভক্ত হয়, তা ছিল কেশবচন্দ্র সেনের বড় মেয়ে সুনীতির বিবাহ। এই সুনীতি দেবী ও তাঁর বোন সুচারু দেবীও আত্মকথা লিখেছেন। সুনীতি দেবী'র (১৮৬৪ - ১৯৩২) আত্মজীবনী ইংরাজীতে লেখা - অটোবায়োগ্রাফী অফ এ্যান ইন্ডিয়ান প্রিন্সেস'। সুচারু দেবীর (১৯৭৪-১৯৬৭) আত্মজীবনী সামান্যই লেখা হয়েছিল, বাকি কথা তাঁর দিনলিপি থেকে জানা যায়। কোচবিহারের মহারাণী সুনীতি দেবী ও ময়ুরভঞ্জের মহারাণী সুচারু দেবীর আত্মকথায় নিজেদেরই কথাই মুখ্যত পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌত্রী ও বিখ্যাত সাহিত্যিক অনুরূপা দেবীও (১৮৮২-১৯৫৮) 'জীবনের শ্রুতিলেখা' নামে আত্মচরিত লিখতে শুরু করলেও শেষ করেননি। তবে সেখানে তাঁর শৈশবের কিছু কথা রয়েচে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী স্বর্ণপদক ও ভুবনমোহিনী দাসী স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অনুরূপা দেবীর জন্মের সংবাদে কিন্তু পরিবরের কেউ-ই খুশি হননি, তাঁর পিতা ছাড়া। এমনকি, ভূদেব মুখোপাধ্যায় কন্যাসন্তান জন্মানোর খবর পেয়েই বলেছিলেন,

''আচ্ছা, আমার সমস্ত সম্পত্তি কোন সাধারণ সৎকার্যে উৎসর্গ করিলে হয় না?''

সময় বদলালেও মেয়েদের অবস্থা যে খুব বেশি বদলায়নি, এই রচনাতে তা স্পষ্ট। তবে তাকে ভুল বলে প্রমাণ করেছিলেন অনুরূপা দেবী স্বয়ং, নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করে। আর এখানেই তিনি আর পাঁচটি মেয়ের থেকে আলাদা।

সেঞ্চুরি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ দাসের স্ত্রী কৃষ্ণভাবিনী দাসের (১৮৬৪-১৯১৯) আত্মজীবনী 'জীবনের দৃশ্যমালা' তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার কথা হলেও তা একটু আলাদা। কারণ, প্রথমতঃ বাংলা গদ্যে দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও তিনি আত্মজীবনীটি লিখেছেন কবিতায়। দ্বিতীয়তঃ সাধারণ ঘরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও তিনি সকলের বিরোধিতা উপেক্ষা করে, শিশুকন্যা তিলোত্তমাকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে স্বামীর সঙ্গে ইংলন্ডে যান। যা সেইসময়ে তাঁর মতো সাধারণ মেয়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব ছিল। এদিকে দেবেন্দ্রনাথের পিতা নাতনীকে, মাত্র দশ বছরের কন্যাকে অপাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন। কৃষ্ণভাবিনী ইংলন্ডে নারী প্রগতির রূপ দেখে অনেকখানি প্রভবিত হয়েছিলেন। কিন্তু এ বিবাহ বন্ধ করতে পারে নি। বিদেশ থেকে ফিরে আসার পরেও হিন্দু সমাজে তাঁদের জায়গা হয়নি। ফলে মেয়েকে তিনি দেখতেও পাননি। নিজের কাছে আনতেও পারেন নি। কয়েক বছর পর তিলোত্তমা অত্যন্ত অসুস্থ অবস্থায় তাঁদের কাছে ফিরে এলেও কয়েক দিন পরেই মারা যান। তিলোত্তমাও কবিতায় তাঁর কথা লিখেছেন, যা তাঁর মৃত্যুর পরে 'আক্ষেপ' নামে প্রকাশ করেন কৃষ্ণভাবিনী দেবী। কন্যার এই পরিণতির পরে তিনি নিজেকে অন্তঃপুরের নারীদের শিক্ষিত করার কাজে নিয়োজিত করেন। তাঁরই উদ্যেগে ভারত স্ত্রী মহামণ্ডলের তিনটি শাখা খোলা হয়। কলকাতা মণ্ডলের পরিচালনার ভার তাঁকেই নিতে হয়। বিভিন্ন প্তরিকায় নারীশিক্ষা প্রসারের বিষয়ে নানা প্রবন্ধও লেখেন তিনি। তাঁর আত্মজীবনীতে কন্যা এই দুর্দশার কথাই বেশি করে উল্লিখিত হলেও নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কারণটিও সেখান থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়। মেয়েদের শিক্ষিত ও সুপাত্রস্থ করার দায়িত্ব নিয়ে মেয়েদের, বিশেষত বালবিধবাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছিলেন লীলাবতী মিত্র (১৮৬৪-১৯২৪)। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও বহু বালবিধবাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর আত্মচরিত্র 'জীবনকথা' তাঁর দিনপঞ্জির সাহায্যে রচিত হয়ে প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। সেখানে ব্রাহ্ম ধর্মের কথাই মূলত লিখেছিলেন তিনি।

নারীদের আত্মজীবনী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ঠাকুরবাড়ির নারীদের আত্মচরিত্রের কথা আলাদা করে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে প্রদান হলেন সরলা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭২-১৯৪৫) এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী (১৮৭৩-১৯৬০)। কারণ, উনিশ শতকে নারীজাগরণের ক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির অন্দরমহলের অবদান প্রচুর। শিক্ষায়, অভিজাত্যে, রুচিতে, উদারমনস্কতায় তাঁরা ছিলেন সমকালীন অভিজাত ও ব্রাহ্ম সমাজের মহিলাদের কাছে আদর্শস্থানীয়া। তাঁরা সমালোচিত হতেন, আবার সম্মানও পেতেন। মূলত এঁদের দ্বারাই বাঙালি নারী সমাজ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এঁদের সবাই আত্মজীবনী লেখেন নি। জ্ঞানদানন্দিণী দেবীর পর বিখ্যাত আত্মচরিত রচয়িতা সরলা দেবী চৌধুরাণী। তাঁর লেখায় সমাজের কথা সরাসরি নেই, ব্রাহ্মসমাজের কথাও তেমন কিছু নেই, আছে সরলার নিজের কথা; স্বামী-সংসার-সন্তানের চিরাচরিত কথা নয়; নিজের আসা-নিরাশা, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের নানা অধ্যায়ের কথা। তিনি যে কতটা স্বাধীনচেতা ছিলেন, তা 'জীবনের ঝরাপাতা' পড়লে বোঝা যায়। সর্বগুণসমন্বিতা এই মেয়েটি জীবনের বেশিরভাগ কাজ করেছেন খেয়ালের বশে। ঠাকুরবাড়ির প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট সরলা ফিজিক্স পড়তে চেয়েছিলেন দাদাদের সমান হওয়ার খেয়ালে—

''কিন্তু আমার দৃঢ় পণ ছিল আমি বাড়ির ছেলেদের সমান সমান ফিজিক্সই নেব।''

সেই খেয়ালও বেশিদিন থাকে নি। অবিবাহিত অবস্থায় চাকরি করতে গিয়েছিলেন সুদুর মহীশূরে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র আকাঙ্খায়। এতটা স্বাধীনতা তখন মেয়েরা পেতেন না। চাকরি করার নজির অবশ্য এর আগে ছিল। কামিনী রায়ের পিতার আপত্তি সত্ত্বেও তিনি চাকরি করেছিলেন বেথুন কলেজে। কিন্তু বিদেশে একা চাকরি করেন প্রথম সরলাই। শুধু তাই নয়, সাহিত্য রচনা, 'ভারতী' পত্রিকা সম্পাদনা, সঙ্গীত রচনা, স্বদেশী দ্রব্য প্রচলনের জন্য 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' স্থাপন, প্রতাপাদিত্য, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি উৎসব প্রচলন— সব কিছুর মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনে কম বৈচিত্র্য ছিল না। সব দিক দিয়েই সরলা ছিলেন দমকা হাওয়ার মতো, যা সমকালীন সমাজে ছিল কল্পনার অতীত। এই কারণে তাঁর আত্মজীবনীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়।

সরলা দেবীর পরে ঠাকুরবাড়িতে বি.এ. পাশ করেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। তবে তিনি সরলার মতো খেয়ালখুশিতে চলেন নি। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে তিনিই প্রথম ফরাসী ভাষাকে পাঠ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেন। বহু ফরাসী ও ইংরাজী রচনার বঙ্গানুবাদও করেন তিনি। স্বরলিপি রচনার কাজে তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের স্নেহের পাত্রী ইন্দিরা 'ভূবনমোহিনী' স্বর্ণপদক সহ বহু সম্মানে ভূষিতা ছিলেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন প্রমথ চৌধুরীকে। তাঁর আত্মজীবনী 'শ্রুতি ও স্মৃতি' পাণ্ডুলিপি আকারে বিশ্বভারতীতে রক্ষিত আছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। শিক্ষা, রুচি ও বিবাহের ক্ষেত্রে সরলা ও ইন্দিরা চিরাচরিত প্রথাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বাঙালি মেয়েদের সামনে উদাহরণ তৈরি করে দিয়েছিলেন। যাকে অনুসরণ করে মেয়েরা পুরাতন প্রথার অচলায়তনকে ভেহে আধুনিকতার দিকে চলার সাহস পেয়েছিল।

ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে শ্রীনাথ ঠাকুরের কন্যা ইন্দিরা দেবী (১৯৬৩-১৯৩৯) 'আমার খাতা', গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা বিনয়িণী দেবী (১৮৭৩-১৯৩১) 'কাহিনী' এবং গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা পূর্ণিমা দেবী (১৮৯৫-১৯৮০) 'চাঁদের বুড়ি' নামে আত্মজীবনী লিখেছিলেন। এর মধ্যে পূর্ণিমা দেবীর আত্মকথা অসমাপ্ত। তবে এই রচনাগুলিতে তাঁদের শৈশবের ছোট ছোট কথা ও জীবনের কিছু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত না হলেও হেমন্তবালা দেবী'র (১৮৯৪-১৯৭৬) আত্মকথা 'নিজের কথা' ও স্মৃতিকথা 'আমার চোখে দেখা রবীন্দ্রনাথ' -এ রবীন্দ্রনাথের কথা পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্মের সাধারণ কুলবধু ছিলেন না তিনি। জমিদার কনা হেমন্তবালা ছিলেন প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বময়ী। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচার মুখ বুজে না মেনে তিনি কিশোরানন্দ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে অন্যায়ের প্রতিবাদ জানান। রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাস পড়ে তিনি পাত্রালাপ শুরু করেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তিনি নিজেও ছিলেন সুলেখিকা। বহু বছর আগে সারদাসুন্দরী দেবী যে ঘটনার প্রতিবাদ করতে পারেন নি, তা করেছিলেন হেমন্তবালা দেবী। তাঁর আত্মজীবনী তাই শুধু অসহায়ের হাহাকার নয়, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এক নারীর জীবনালেখ্য।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) তাঁর 'শ্রাদ্ধিকী' গ্রন্থে, প্রতিমা দেবী (১৮৯৩-১৯৬৯) তাঁর 'নির্বাণ' ও 'স্মৃতিচিত্র' গ্রন্থে, মীরা দেবী (১৮৯৪-১৯৬৯) তাঁর 'স্মৃতিকথা'য়, সীতা দেবী (১৮৯৫-১৯৭৪ঃ 'সেদিনের কথা' ও 'নানা রঙের দিনগুলি' গ্রন্থে অন্যদের কথাই মূলত লিখেছেন। তবুও এই রচনাগুলিতে তাঁরা যথাসম্ভব নিজেদের আড়ালেই রেখেছেন।

রাসসুন্দরী দেবী থেকে শুরু করে (স্বাধীনতার পূর্বে রচিত) পূর্ণিমা দেবীর আত্মজীবনীর বিষয়, আঙ্গিক, ভাবনা অনেক কিছুই বদলেছে। নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে ক্রমশই সচেতন হয়েছেন তাঁরা। নিছক নিজেদের কথা নয়, সমাজের কথা, পারিপার্শ্বিকের কথাও ক্রমে স্থান করে নিয়েছে তাঁদের আত্মকথায়। আর নারীর আত্মজীবনীর পথটি কল্পনা করলে তাতে মাঝে মধ্যেই বাঁক এনেছে কৈলাসবাসিনী দেবী, সুদক্ষিণা সেন, বিনোদিনী দাসী কিংবা ঠাকুবাড়ির মেয়েদের আত্মকথার। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গির, মানসিকথার বদল হয়। সেই বদলের ইতিহাসই আত্মকথার এই ক্রমবিবর্তন। যাঁদের আত্মকথা আলোচিত হয়েছে, তাঁরা প্রত্যেকেই যে মহান কোনো কীর্তি রেখে গেছেন উত্তরপুরুষের জন্য, তা নয়। কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষী হিসাবে, ইতিহাসের অজ্ঞাত 'ইতিহাস' হিসাবে অমর হয়ে আছে তাঁদের কাহিনি, সেই সঙ্গে তাঁরাও।

ঋণস্বীকার:

**রচনাটি জন্য প্রয়োজনীয় বহু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বিভিন্ন আত্মজীবনী এবং শ্রমতী চিত্রা দেব রচিত 'অন্তঃপুরের আত্মকথা' থেকে।**